আমাদের কথা

যৌনকর্মীদের মুখপত্র আগস্ট ২০০৬

সম্পাদকীয়

'যৌনকর্মীদের অধিকার ও দক্ষতা' বিষয়ে চারদিনব্যাপী কর্মশালার ফসল 'আমাদের কথা'। এর সকল লেখাই যৌনকর্মী কিংবা যৌনকর্ম সম্পর্কিত। একজন যৌনকর্মীর জীবনের অভিজ্ঞতা, তার অব্যক্ত কষ্ট ও দুঃখবোধ, পাওয়া 'না পাওয়া, তার পারিপার্শিক অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষা এবং যৌনকর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্যোগ 'আমাদের কথা'র উপজীব্য।

কোনো দাবি আদায়ে, নিজের সম্পর্কে অপরকে জানাতে কথা বলাটা খুব দরকার। নিজের কথা নিজে না বলতে পারলে অন্য কেউ বলে দেয় না, শুনতেও চায় না। এ-কর্মশালা আয়োজনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল যৌনকর্মীদের কথা বলার সক্ষমতার অনুসন্ধান করা। বস্তুত যৌনকর্মীরা অনেক কথা বলতে চান। সুযোগ পেলে তারা সুন্দরভাবেই তাদের কথা বলতে পারেন। চাই কিছু সহযোগিতা, সমানুভূতি। এ নিউজলেটারের লেখাগুলো কিছু তাদের নিজেদের, কিছু অনুলিখন। আজ যাঁরা অন্যের মাধ্যমে লিখেছেন কাল যে তাঁরা নিজেরা তা পারবেন না–তা নয়। এটা একটা শুরু মাত্র। 'আমাদের কথা'র আত্মপ্রকাশ আরো সম্ভাবনার দিকে একটি ছোট ইঙ্গিত, আরো অনেক কথা বলার ক্ষেত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা।

সূচি

যৌনকর্মীদের অধিকার ও দক্ষতা বিষয়ে চার দিনব্যাপী কর্মশালা ২
যৌনকর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা কেন? ৩
"পৃথিবীতে যতদিন ধান-পাটের ব্যবসা থাকবে ততদিন যৌন ব্যবসা থাকবে" —*মায়া* ৪
ঢাকার রাস্তায় ভাসমান যৌনকর্মী —*রাজিয়া, পারুল, সুরাইয়া* ৪
উচ্ছেদের পর টানবাজার যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের সীমাহীন দূর্ভোগের কাহিনী —*কাজল ও লাবনী* ৬
হারিয়ে যাবে সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লী! —*কবিতা* ৮
একাকিত্বের জীবন আমার —*কথা* ৯
চলার পথে বাধা —*জয়া* ১০
সমঝোতার মাধ্যমে পটুয়াখালী যৌনপল্লী উচ্ছেদ বন্ধ করা গেল —*মমতাজ বেগম* ১১
'মরলে যেন জানাযা হয়' —*পারু* ১২
জামালপুর যৌনপল্লী —*ময়না* ১৩
ময়মনসিংহ যৌনপল্লী: অবস্থার পরিবর্তন হলেও অবহেলিত তারা —*মনিরা* ১৩
নিজের মানুষও প্রতারণা করে —*হাজেরা* ১৪
সোনিয়ার মৃত্যু ও আমাদের অধিকার ১৪

যৌনকর্মীদের নিয়ে প্রকাশনা ১৫
বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি: জীবনের দামে কেনা জীবিকা
তৃতীয় প্রকৃতি: বাংলাদেশের হিজড়াদের আর্থসামাজিক চিত্র
ফিরে দেখা (নারী অধিকার, মানবাধিকার ও যৌনকর্মীদের লড়াই)

"বিবাহ এবং যৌনতা বিক্রি ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা এবং দুটোই প্রতিষ্ঠান। এই মৌলিক প্রতিষ্ঠান দুটোর মধ্য দিয়ে যৌন জীবনের অভিজ্ঞতা ঘটে এবং নারী যৌনদাসত্বে আটকা পড়ে। পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে যৌনতা কেনাবেচা হয়, আর বিবাহের মাধ্যমে একে আইনসিদ্ধ করা হয়।" –ক্যাথলিন বেরি, নারীর যৌনদাসত্ব বিশেষজ্ঞ, *নিউ ইন্টারন্যাশনালিস্ট*, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪।

যৌনকর্মীদের অধিকার ও দক্ষতা বিষয়ে চার দিনব্যাপী কর্মশালা

ঢাকার ওয়াইডব্লিউসিএ ভবনে ৭ জুন (২০০৬) শুরু হয় 'যৌনকর্মীদের অধিকার ও দক্ষতা' বিষয়ে চার দিনব্যাপী একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। আয়োজক প্রতিষ্ঠান সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এবং সেক্সওয়ার্কাস নেটওয়াক অব বাংলাদেশ। কর্মশালার ২২ জন অংশগ্রহণকারীর অধিকাংশই যৌনকর্মী, কিছু সাংবাদিক এবং গবেষক।

কর্মশালার প্রথম দিন কর্মশালার উদ্দেশ্য এবং পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আয়োজক প্রতিষ্ঠান সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন বলেন, "একটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেড জন্মলগ্ন থেকেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকারের প্রশ্নে কাজ করে আসছে। যৌনকর্মীরা একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। যৌনকর্মীদের অবস্থা ও অধিকারের বিষয় তুলে ধরতে কয়েক বছরের অনুসন্ধানের ফল হিসাবে বাংলা এবং ইংরেজিতে দুটো বই প্রকাশ করেছে সেড। বইগুলো সমাদৃতও হয়েছে। এই কর্মশালা সেড-এর ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের ফল।"

কর্মশালাকে আবাসিক করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "যৌনকর্মীদের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সহনশীল করার জন্য তাদের সম্পর্কে অন্যদের জানানো খুবই দরকার। যৌনকর্মীর জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব তাদের প্রতি সামাজিক অবিচারের অন্যতম কারণ। এ-কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী যৌনকর্মীরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের কথা বলবেন। তাদের কথা নিয়েই বের হবে একটি নিউজলেটার। অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক যোগাযোগ নিবিড় হলেই এমন কাজ সম্ভব। তাই এ-কর্মশালা আবাসিক করা হয়েছে।"

'নিজের কথা নিজে বলি ও লিখি' বিষয়ে এ-দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে কথা বলেন সাংবাদিক ও গবেষক কুর্‌রাতুল আইন তাহ্‌মিনা। সঙ্গে ছিলেন হাজেরা ও কাজল। উপস্থিত যৌনকর্মীদের কাছ থেকেই মিস তাহ্‌মিনা শোনেন তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা। তিনি বলেন, "আমাদের সংবাদপত্রের বেশির ভাগ পাঠক মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তাই তাদের কথাই বেশি থাকে পত্রিকায়। যৌনকর্মীরা তখনই পত্রিকার সংবাদ হন যখন তাদের ওপর বড় রকমের কোনো নিপীড়নের ঘটনা ঘটে।"

তাহ্‌মিনা বলেন, "যৌনকর্মীদের সব কথা পত্রিকা বলবে এটা আশা করা যায় না। সব থেকে ভালো হয় তাঁরা নিজেরা যদি নিজেদের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন।"

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী।

তিনি যেসব উৎস যৌনকর্মীরা তাদের কথা বলার জন্য ব্যবহার করতে পারেন সেসব সম্পর্কে কথা বলেন।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিন 'যৌনকর্ম বিষয়ক আইন, যৌনকর্মীর অধিকার ও রাষ্ট্র' বিষয়ক আলোচনায় অ্যাডভোকেট সালমা আলী বলেন, "যৌনকর্ম এবং এ কাজের সাথে নিয়োজিতদের সম্পর্কে সংবিধান এবং প্রচলিত আইনের মধ্যে একটা দূরত্ব রয়েছে। প্রচলিত আইন মোটেও পরিস্কার নয়।"

অ্যাডভোকেট আলী বলেন, "যৌনকর্ম কখনোই পেশা হতে পারেনা, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। কিন্তু বিকল্প কোনো কাজের সন্ধান যেহেতু এ-কাজের সাথে জড়িতদের আমরা দিতে পারছিনা তাই তাদের এ-কাজ থেকে আমরা নিবৃত করতে পারি না।"

এদিন যৌনকর্মীদের নিয়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে কথা বলেন 'অপরাজেয় বাংলাদেশ'-এর ওয়াহিদা বানু। তিনি যৌনকর্মীদের নিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ডে সমন্বয়হীনতা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। ওয়াহিদা বানু বলেন, "যৌনকর্মীদের প্রতি যদি মমত্ববোধ না থাকে তাদেরকে যদি প্রকল্প বানানোর হাতিয়ার মনে করি তবে যৌনকর্মীদের প্রকৃত উন্নয়ন কখনোই সম্ভব হবে না।"

'যৌনকর্মীদের আচার-আচরণ ও নিরাপত্তা' নিয়ে এদিন আলোচনা করেন 'উৎস'-এর পরিচালক মাহবুবা মাহমুদ লীনা। তিনি বলেন, "একজন যৌনকর্মী যৌনকর্ম করে নিজের পেট চালান, সন্তানাদি লালন-পালন করেন। তাই অপরাপর জীবিকার মতো এটিও একটি জীবিকা বা পেশা। এখানে কারো স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই।" তিনি বলেন, "পৃথিবীর সব নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ প্রকাশের মাত্রা তীব্র হয়। যৌনকর্মীদেরও তাই। কিন্তু নিজেদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা যত থাকুক, যত তারা গন্ডগোল করুক, দেখা যায় তাদের কেউ অন্যের হাতে নিগৃহীত হলে তারা একসাথে দাঁড়িয়ে যায়। একে অন্যের সাথে ঝগড়া

মারামারি যাই-ই করুক না কেন একে অন্যের ক্ষতি করে না।"

মাহবুবা মাহমুদ বলেন, "যৌনকর্মীদের আত্মমর্যাদাহীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাদের প্রতিটা কর্মকান্ডে তারা অপরাধী মনোবৃত্তি নিয়ে অংশ নেয় বা তাদের আচরণ সঠিক নয় বলে মনে করেন। নিজেরাই নিজেদের 'খারাপ' বলে মনে করেন। তাদেরকে এই মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে।"

কর্মশালার তৃতীয় দিন 'সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি' সংক্রান্ত আলোচনায় কেএম নুরুল গণি সংগঠন, নেটওয়ার্ক ও অ্যালায়েন্স নিয়ে আলোচনা করেন। মি: গণি সংগঠনের নেতৃত্বের স্বচ্ছতাকে সংগঠনের প্রাণ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। 'সঞ্চয় কর্মসূচি ও সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা' সংক্রান্ত আলোচনায় টিআইএম জাহিদ হোসেন সঞ্চয়ের নানা উপায় এবং এর ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতার উপর জোর দেন।

এদিন 'বাংলাদেশের হিজড়া সমাজ' বিষয়ে আলোচনা করেন এসএএম হুসাইন। তিনি হিজড়াদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নানা প্রতিকূলতা, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

কর্মশালার শেষ দিনের আলোচ্য বিষয় 'যৌনকর্ম দেশে দেশে', 'যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও আবাসন' এবং 'যৌনপল্লীর শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিশু শিক্ষা' বিষয়গুলোর আলোচক যথাক্রমে কল্পনা রানী, খন্দকার রেবেকা সানইয়াত এবং আবু ইউসুফ চৌধুরী।

অংশগ্রহণকারী: আলেয়া (জয় নারী কল্যাণ সংঘ), কবিতা (পদ্মা নারী সংঘ), ময়না (সৌরভ সমাজ কল্যাণ সংঘ), কাজল (অক্ষয় নারী সংঘ), মনিরা (সৌরভ নারী কল্যাণ সংঘ), হাজেরা (শুকতারা নারী কল্যাণ সংঘ), মহুয়া (নারী মুক্তি সংঘ), পারভিন (মুক্তি মহিলা সমিতি), পারুল (উল্কা নারী সংঘ), সুরাইয়া বেগম (উল্কা নারী সংঘ), শাহানাজ (দুর্জয় নারী সংঘ), রাজিয়া (দুর্জয় নারী সংঘ), লিপি আক্তার (দূর্জয় নারী সংঘ-খুলনা শাখা), ফাতেমা বেগম লাবনী (ডি-নেট), আশরাফি ফেরদৌসী বীথি (নিউজ নেটওয়ার্ক), মুন্নী মৃ (সেড), শেখর কান্তি রায় (সেড), সুবোধ,এম বাস্কে (সেড) ও শামিমুল ইসলাম (সেড)।

প্রশিক্ষক: ফিলিপ গাইন (সেড), কুর্‌রাতুল আইন তাহ্‌মিনা, অ্যাডভোকেট সালমা আলী (বিএনডব্লিউএলএ), ওয়াহিদা বানু (অপরাজেয় বাংলাদেশ), মাহবুবা মাহমুদ লিনা (উৎস), পার্থ শঙ্কর সাহা (সেড), কে.এম. নুরুল গনি (কেয়ার বাংলাদেশ), টি আই এম জাহিদ হোসেন (অ্যাকশন এইড), এস.এ.এম. হুসাইন (নারীপক্ষ), কল্পনা রানী (কর্নসার্ন বাংলাদেশ), খন্দকার রেবেকা সানইয়াত (ইউপিএইচসিপি), আবু চৌধুরী ইউসুফ (পায়াক্ট বাংলাদেশ) ও মমতাজ বেগম (সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ)। *পার্থ শঙ্কর সাহা*

যৌনকর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা কেন?

যৌনকর্ম আমাদের সমাজের চোখে একটি অসম্মানজনক কাজ হিসাবেই বিবেচিত হয়। আর যারা এ পেশায় নিয়োজিত তাদেরকে নানা অশালীন শব্দে আখ্যায়িত করা হয়। বিভিন্ন সূত্রমতে বাংলাদেশে যৌনকর্মীর সংখ্যা ৬০,০০০ (২০০৪)। এসব যৌনকর্মী যৌনপল্লী [১২টি], হোটেল এবং ভাসমান (রাস্তা-ঘাটে) অবস্থায় কাজ করেন। তবে এই সংখ্যার মধ্যে তাদের ধরা হয়নি যারা বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় কাজ করেন এবং যাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। যৌনকর্মীদের একটা বড় অংশ শিশু। যৌন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সংঘবদ্ধ চক্রের হাতে পড়ে, দারিদ্র্যের কারণে, স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হাতে নির্যাতিত হয়ে বা কাজের সন্ধানে এসে যৌনকর্মীদের অধিকাংশ এ পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। একবার যে নারী এ পেশায় আসতে বাধ্য হন, তার জীবন আটকা পড়ে যায় সীমাহীন বেদনা, শোষণ, বঞ্চণা এবং চরম সহিংসতার মধ্যে। যৌনকর্মীদের উপর অমানবিক আচরণের একটি দিক হলো আইন ও আদালতের নির্দেশ অমান্য করে তাদের উচ্ছেদ করা। প্রায় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক শক্তি এবং সরকারি সংস্থা যৌথভাবে এই বেআইনী ও অনৈতিক কাজটি করে থাকে।

নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যৌনকর্মীরা শক্তভাবে দাঁড়াবার ও নিজেদের রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৯ সালে দেশের সবচেয়ে বড় যৌনপল্লী (নারায়ণগঞ্জের টানবাজার) উচ্ছেদের পর তারা এই নৃশংস হামলার প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন। বিভিন্ন স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার উল্লেখযোগ্য সমর্থনও তারা সে সময় পেয়েছেন।

তবে মানুষ হিসাবে অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামে বাংলাদেশের যৌনকর্মীরা এবং তাদের সংগঠন এখনো অনেক পেছনে। তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং আরো নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেক কিছুর প্রয়োজন। এর মধ্যে কয়েকটি হলো: নিজেদের কথা নিজেদেরকে বলার ক্ষমতা অর্জন, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার প্রয়োজনে আয় কাজে লাগানো, সংগঠন চালাবার জন্য ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়ানো, যৌনকর্ম সম্পর্কিত আইন ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পরিবর্তন এবং যৌনকর্মী ও তাদের সন্তানদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনের নিশ্চয়তা বিধান।

এসব বিষয় মাথায় রেখেই সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এবং সেক্স ওয়ার্কার'স নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ ৭-১০ জুন আয়োজন করেছে এক আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই যৌনকর্মীদের নিজেদের সংগঠনের নেতা-কর্মী, কিছু মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক। প্রশিক্ষকদের মধ্যে থাকবেন আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী ও বিশেষজ্ঞ, যৌনকর্মীদেরকে সহায়তা

করে আসছেন এমন সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মী এবং আয় ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ।

যৌনকর্মীদের নিয়ে সেড কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে তাদের অধিকার বিষয়ে তথ্য-তালাশের কাজ করে আসছে এবং বাংলা ও ইংরেজিতে বই প্রকাশ করেছে যা এখন অনেকেই ব্যবহার করেন। এ বইয়ে যৌনকর্মীদের (বিশেষ করে যারা দরিদ্র) বিভিন্ন দিক ও উদ্বেগ নিয়ে নানা তথ্য উপাত্ত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। সেক্স ওয়ার্কার'স নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ দেশের ২২টি যৌনকর্মীদের সংগঠনের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। ঐক্য, সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যৌনকর্মীদের অধিকার আন্দোলন জোরদার করাই এর মূল লক্ষ্য।

প্রতিষ্ঠান দুটো তাদের গবেষণা ফলাফল ও অভিজ্ঞতা পুঁজি করে যৌনকর্মীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এ কর্মশালার আয়োজন করেছে। কর্মশালায় একদিকে যেমন বাংলাদেশে যৌনকর্মের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হবে তেমনি যৌনকর্মীরা যাতে নিজেদের কথা নিজেরাই বলতে পারেন, লিখতে পারেন, নিজেদের সংগঠন আরো দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারেন এবং নিজেদের আয় কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো করতে পারেন সেসব বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

"পৃথিবীতে যতদিন ধান-পাটের ব্যবসা থাকবে ততদিন যৌন ব্যবসা থাকবে"

—মায়া

"পৃথিবীতে যতদিন ধান-পাটের ব্যবসা থাকবে ততদিন যৌন ব্যবসা থাকবে" বললেন টাঙ্গাইলের নারী মুক্তি সংঘের সদস্য মায়া। তিনি আরও বলেন, "যতদিন মানুষের খাদ্যের চাহিদা থাকবে, ততদিন যৌন ব্যবসা থাকবে এবং আমরা তা চালিয়ে যাবো। আর পুরুষ যদি আমাদের সাথে সেক্স করে ঘরে ফিরতে পারে তবে আমরা কেন ঘরে ফিরতে পারবো না?" টাঙ্গাইল কান্দাপাড়ার যৌনপল্লী ১৫০ বছরের পুরানো। এখানে ৬০ টি বাড়িতে ৮০০ টি ঘরে প্রায় ৮৬০ জন মেয়ে থাকে। বাড়িওয়ালীর সংখ্যা ৬৫, ভাড়াটিয়া ৬৪০ জন এবং ছুকড়ির সংখ্যা ৩৭০ জন। যৌনপল্লীতে ০-৫ বছর বয়সের ১৯০ জন শিশু এবং ৫-১০ বছর বয়সের ৭০ জন শিশু যৌনপল্লী সেফ হোমে থাকছে। যৌনপল্লীতে কাজ করছে বিডব্লিউএইচসি, এসএসএস, কেয়ার এবং সমবায় দৃষ্টি। এ এনজিওগুলোর সহায়তায় যৌনকর্মীদের অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

কর্মশালায় আলোচনা করছেন মায়া।

এ প্রসঙ্গে মায়া বলেন, "আগে আমাদের অনেক কষ্ট ছিল। এখন আমরা অনেক ভাল আছি। যেমন, আগে আমাদের যৌনকর্মী হিসাবে চিহ্নিত করতে জুতা পরতে দেয়া হত না। ঈদের দিন তিন হাজার টাকা দামী শাড়ি পরলেও পায়ে জুতা দিতে পারতাম না। বাড়ি যাওয়ার সময় জুতা বগলের নিচে নিয়ে অর্ধেক রাস্তায় গিয়ে তা পায়ে দিতাম। আবার তিনদিনের কথা বলে বাড়ি গিয়ে পাঁচদিন পর আসলে তার জন্য জরিমানা দিতে হত। নতুন কোনো মেয়ে এলে হাটে যেমন গুরুর দাম হাকা হয় তেমন মেয়েটির দাম হাকা হতো। এভাবে সে বিক্রি হতো। এখন আর সে অবস্থা নেই। আগে মাস্তানরা টাকা-পয়সা নিয়ে যেত, এখন আর তা করতে পারে না। আগে আমরা স্বাস্থ্য সচেতন ছিলাম না। এনজিওগুলো এ ব্যাপারে এগিয়ে এলে আমরা প্রথমে ভুল বুঝে তাদের তাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু তাদের সহায়তায় এখন আমরা এইড্‌সসহ বিভিন্ন যৌনরোগ সম্পর্কে জানি।"

তিনি আরো বলেন, "আগে আমাদের কোনো সঞ্চয় ছিল না। এখন আমরা সঞ্চয় করি। এখন আমাদের নিজস্ব কবরস্থান আছে। তারপরও সরকারের বড় বড় লোকেরা অনেক বড় বড় কথা বলে কিন্তু তাদের কাছে কোনো কাজ নিয়ে গেলে তারা আমাদের মূল্যায়ন করে না। অধিকারের কথা বলতে গেলে সমাজের অনেকে বলে "তোরাতো পাড়ায় থাকিস, তোদের আবার অধিকার কী?" বর্তমানে ঘরভাড়া প্রতিদিন ১০০-১২০ টাকা, এটা অনেক বেশি। কেননা একজন যৌনকর্মী ১/২ জন খদ্দের পায়। তার আয় হয় গড়ে ১০০ টাকা। সে এটাকা ঘর ভাড়া দিলে খাবে কী? এটা কমানো উচিত। এ ব্যাপারে এনজিওগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন।

সবশেষে মায়া বলেন, "আমাদের নিজস্ব ফান্ড নেই, ফান্ড থাকলে বর্তমানে যে পরিবর্তনের ধারা তা এগিয়ে যেত, তাই ফান্ড প্রয়োজন।" *অনুলিখন: বিথী*

ঢাকার রাস্তায় ভাসমান যৌনকর্মী

—রাজিয়া, পারুল ও সুরাইয়া

২০০১ সালের ঘটনা। তখন আমি ভাসমান যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করি। তখন রাত ৩:৩০ মিনিট। আমি এবং

আরও ২টি মেয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি ধোলাইখাল এলাকায়। হঠাৎ করে ৩টি ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমাদের সাথে কাজে যাবা? আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমরা কোথায় নিয়া যাবা? একজন বললো, ধোলাইখালের মাথায়। ইতিমধ্যে আমার সাথের দু'জন চলে গিয়েছিল এরমধ্যে একজন আবার ফিরে এসেছে। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম তোমরা কয়জন? তারা বললো চারজন। দুইশ টাকায় তাদের সাথে রাজী হলাম। তারা আমাকে নগদ আশি টাকা দিল। আমি আমার গলার চেইন, ঘড়ি, ব্যাগে ঐ মেয়ের কাছে রেখে তাদের সাথে রওনা হলাম।

ধোলাইখালেরর মাথায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলে তারা আমাকে নিয়ে গেল কাওয়ার টেক-এর ভেতর পুকুর পাড়ে। সেখানে একটি ভাঙ্গা ঘরে আরো ৫ জন ছিল। আমি তাদের বললাম আপনারা আমাকে চারজনের কথা বলেছিলেন কিন্তু এখন দেখছি ৭ জন। তারা বললো আমরা সাতজনে কাজ করবো তোর টাকা পাইলেই হলো। এরপর ৭ জনে প্রথমে ৭ বার কাজ করলো। তারপর তারা চাকু, চাপাতি, ছুরি এবং পিস্তল বের করে আমাকে ভয় দেখিয়ে আবার সাতবার কাজ করলো। আমার তখন গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পানি খেতে দেয়নি। তারা আমাকে মেরে ফেলতে চাইল। আমি তাদের হাতে পায়ে ধরলাম। বললাম, ভাই আমাকে মারবেন না। আমার স্বামী নেই। আমার একটা ছোট মেয়ে আছে। সে এতিম হয়ে যাবে। আমার অনেক কান্নাকাটির পর তারা বললো এখানে যা ঘটেছে তা কাউকে বলবি না; বললে তোকে পিছন থেকে গুলি করব। এরপর তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। রাস্তায় একটা দোকান থেকে পানি খাই। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে বাসায় দরজার সামনে এসে জ্ঞান হারাই। এরপর নিলু নামের এক যৌনকর্মী বোন আমাকে তুলে ঘরে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর ২ মাস আমি ঘরের বাইরে আসিনি। কারণ আমি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিলাম।

ঘটনাটি সুরাইয়া নামের যৌনকর্মীর। সৎ মামার দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়ে সে যৌন কাজে আসে।

একটি মেয়ে, সে শিশু হলেও পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র

(বাম দিক থেকে) কাজল, সুরাইয়া ও পারুল।

কোথাও তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। ঘরে আত্মীয়-অনাত্মীয় পুরুষের দ্বারা আবার, বাইরে নানা বয়সী পুরুষের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয় মেয়েটিকে। এরমধ্যে পরিবারটি যদি হয় দরিদ্র তবে নির্যাতনের পরিমাণ হয় আরো বহুগুণ। পুরুষ শাসিত সমাজে যথাযথ নিরাপত্তার অভাবে এবং দরিদ্রতার কারণে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় মেয়েটি যৌনকর্মকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে।

কিন্তু যৌন কাজের মাধ্যমে অর্থের যোগান বা সংস্থান মোটামুটি হলেও এই মেয়ের জীবনে হাজারো রকমের নির্যাতন আর অন্যায় যুক্ত হয়। নিরাপত্তার বিষয়টি এদের জীবনে অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। নানা পক্ষ যারা মেয়েটির এ কাজের ভাগীদার হয় তারাই আবার ভূমিকা নেয় নির্যাতকের। এদের মধ্যে আবার বিশেষ করে যারা রাস্তায় কাজ করেন তাদের উপর সব পক্ষের প্রত্যক্ষ নির্যাতন সহজ হয়। যৌনপল্লীতে একজন যৌনকর্মীর উপর নির্যাতন করলে অন্যরা এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু যারা রাস্তায় কাজ করেন তাদের পক্ষে কথা বলার একটি লোকও পাওয়া যায় না। তাদের প্রতিদিনকার জীবন চলে তাদেরকে ব্যবহারকারীদের দয়া-মায়া, করুণার উপর।

ভাসমান যৌনকর্মীরা কাজ করেন রাস্তায়, পার্কে, দোকানের সামনে, গলি-ঘুপচিতে, ফাঁকা অফিস বিল্ডিংয়ে বা খোলা জায়গায়। আবার খদ্দেররা নিয়ে যায় বাসা বাড়িতে, মেসে, হোটেলে। যেখানেই যান তারা কাজ করতে হয় খদ্দেরের ইচ্ছামাফিক। খদ্দেরদের মধ্যে ছাত্র, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী সবরকম পুরুষরাই আছেন।

রাস্তার যৌনকর্মীরা নিজেরা রাস্তায়, পার্কে ঘুরে খদ্দের যোগাড় করেন অথবা দালাল খদ্দের ঠিক করে দেন। দালাল হিসেবে কাজ করেন রিক্সাওয়ালা, হোটেল রেস্টুরেন্টের কর্মচারী, পার্কের কর্মচারীরা।

যারা ভাসমান যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করেন তাদের ওপর রাস্তায় বের হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় নানান রকম নির্যাতন। মহল্লার পান-বিড়ি দোকানদার থেকে শুরু করে বখাটে ছেলেরা তাদেরকে গালাগালি দেয়। বিভিন্ন পক্ষের নির্যাতন থাকলেও ভাসমানরা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় পুলিশের। পুলিশ তাদের ফাঁড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে শরীর ভোগ করে। টাকা-পয়সা কিংবা গয়নাগাটি থাকলে কেড়ে নেয়। তাদের কথা না শুনলে ধরে নিয়ে যায় থানায় অথবা ভবঘুরে কেন্দ্রে, মারধর করে। সুরাইয়া নামের মেয়েটি তার ফোলা হাত দেখিয়ে বলল, "পুলিশে পিটাইয়া হাত ভাইঙ্গা দিছে, ৩ মাস কাজে যাইতে পারি নাই।"

মাস্তানদের নির্যাতন আরো ভয়াবহ। তারা একসাথে ১০/১৫ জন কাজ করে। কাজ শেষ হলে টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়। একটি দামি শাড়ি গায়ে থাকলে তাও কেড়ে নেয়। মারধর করে, গালাগালি করে। মাস্তানদের কাছে বেশির ভাগ সময়ই অস্ত্র থাকে। 'ফিরি কাজ' করে আবার

অস্ত্র দিয়ে টানও মারে। কনডম ব্যবহার করতে চায় না। মাস্তানরা অনেক সময় যৌনকর্মীদেকে ভোগ করার পর মেরেও ফেলে।

খদ্দেররা টাকা-পয়সার চুক্তি করে নিলেও অনেকেই একদুই জনের জায়গায় আটদশ জন কাজ করে। আবার, যারা মেয়েদের খদ্দের ধরে দেন সেই দালালরাও তাদের নির্যাতন করে। খদ্দেরের কাছ থেকে আগেই টাকা নিয়ে মেয়েদের টাকা দেয় না। অনেক সময় ৫ দিন ১০ দিনের জন্য ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেন খদ্দেরের কাছে টাকা নিয়ে। টাকা তো দেনই না বরং নতুন জায়গায় কিছুই না চেনার জন্য কয়েক দফা নির্যাতনের শিকার হয় মেয়েটি।

বিভিন্ন এলাকায় ডিউটিরত দারোয়ানরা কাজ করতে গেলে তাড়া করে। তাদেরকে টাকা দিতে হয়। তারা 'ফিরি' কাজ করে আবার খদ্দেরসহ ধরলে খদ্দেরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেয়। হুজুর, পুলিশ, মাস্তান, খদ্দের, দারোয়ান, দালাল এসব পক্ষের গুরুতর নির্যাতনের চিকিৎসা করতে যখন যৌনকর্মীরা ডাক্তারের কাছে যান তখন ডাক্তার দূরে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শোনে, কাছে আসে না। আবার কেউ কেউ পিঠে ব্যথা পেলে বুকে চেক করে।

বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা যৌনকর্মীদের মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করছে। ঢাকায় ভাসমান যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে দূর্জয় নারী সংঘ, উল্কা নারী সংঘ নামে দুটি নারী সংগঠন। কান্দুপট্টি থেকে উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের নিয়ে 'উল্কা' নারী সংগঠন শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। তখন থেকে সংগঠনটি যৌনকর্মীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করছে। আইনগত, চিকিৎসা সহযোগিতা প্রদান করছে। এছাড়াও যৌনকর্মীদের মাঝে এইচআইভি/এইড্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ, কনডম, প্রমোশন, এস.টি.ডি চিকিৎসা বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দূর্জয় নারী সংঘ ভাসমানদের মধ্যে উপরিউক্ত কাজগুলি ছাড়াও অন্যতম যে কাজটি করছে তাহলো তারা ভাসমান যৌনকর্মীদের সুবিধার্থে ৭টি যোগাযোগ কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

ভাসমান যৌনকর্মীদের একাংশ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাসা ভাড়া করে থাকলেও অধিকাংশেরই থাকার কোনো জায়গা নেই। এমন যৌনকর্মীরা কাজ শেষে দুর্জয় নারী সংঘের যোগাযোগ কেন্দ্রে দিনের বেলায় বিশ্রাম, গোসল এবং টাকা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে পারেন। তবে রাতে থাকার অনুমতি নেই। সংগঠনের কার্যক্রমের কারণে যৌনকর্মীদের শক্তি কিছুটা বাড়লেও তাদের উপর নির্যাতন, নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা কমেনি। ঢাকায় ভাসমান যৌনকর্মীদের সাথে কথা বলতে গেলে তারা তাদের অসুবিধাগুলো জানান। তারা চান তাদের উপর পুলিশ, মাস্তান, দারোয়ান, দালালদের নির্যাতন বন্ধ হোক। ভাসমান যৌনকর্মীদের জন্য রাত্রে থাকার জন্য এবং প্রসবকালীন সময়ে আশ্রয় নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গার দরকার। *অনুলিখন: মুন্নী মৃ*

উচ্ছেদের পর টানবাজার যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের সীমাহীন দূর্ভোগের কাহিনী

—কাজল ও লাবনী

মায়া (৩০), শিউলী (২৮) দুজন যৌনকর্মী। নারায়নগঞ্জের সারঘাট এলাকায় তারা কাজ করেন। কিছুদিন আগে একরাতে কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় এক মাস্তান ওদের উপার্জিত টাকা ছিনিয়ে নিতে চাইলে ওরা তার প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদের ফল হিসেবে ওই মাস্তান বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে ঐ দুই যৌনকর্মীকে মারাত্মকভাবে আহত করে। আহত মায়া বললেন,"বাঁশের বারিতে আমার বাম হাত আর শিউলীর ডান পা ভাইঙ্গা গেছে। পঞ্চায়েতের কাছে বিচার চাইছিলাম। পঞ্চায়েত শুধু দুই হাজার টাকা জরিমানা ছাড়া আর কিছুই করে নাই। আর তাই বাধ্য হইয়াই এখন কাজ করতে হইতাছে।" শিউলী বললেন,"টানবাজারে যহন ছিলাম তহনও আমগো উপরে অনেক অত্যাচার হইছে কিন্তু এইরহম রাস্তা-ঘাটে মাইর খাই নাই।" মনোয়ারা বেগম (৩৫) ২ নং রেইল গেট এলাকায় পাখার দোকান দিয়ে বসেছেন। সৎ জীবন যাপনের আপ্রান চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার পক্ষে সৎ থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আনোয়ারা বলেন,"পাখা বেইচা দিনে ৫০-৬০ ট্যাকার মত লাভ অয়। আগেতো এর চাইতে অনেক বেশি আয় করতাম। তারপরও সৎ পথে আয় মনে কইরা সব মাইনা নিছিলাম। কিন্তু একবার যার গায় এই 'সিল' লাগে সে আর ভাল অইতে পারে না। আশেপাশের দোকানদার যারা দিনের বেলায় লাথি-গুতা মারে রাইত অইলে হেরাই টাইনা নেয় কোনো চিপায়। মাঝে মাঝে কাজ শেষ কইরা পয়সা না দিয়াও যায়গা। এর চাইতে টানবাজারেই ভাল ছিলাম। বান্ধা রেটে কাম করতাম, মন

(বাম দিক থেকে) রাজিয়া, পারুল ও কাজল।

চাইলে খদ্দের বসাইতাম মন না চাইলে ঘুমাইতাম। এহনতো কুত্তা বিলাইয়ের চাইতেও খারাপ আছি। আমাগো টানবাজারই ভাল ছিল, আমাগো টানবাজার ফিরাইয়া দেন।"

ফাতেমা (৩০) থাকেন বন্দর এলাকায়। সেখানেই তিনি তার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার তথাকথিত স্বামীও তার সঙ্গেই থাকেন। ঘরে স্বামীর নির্যাতন আর বাইরে সাধারণ মানুষের নির্যাতন সহ্য করে কোনোমতে টিকে আছেন। ফাতেমা বললেন,"সারাজীবন শুনছি স্বামী নাকি স্ত্রীরে ভরণ পোষণ দেয়। কিন্তু আমার স্বামীতো সারাদিন ঘরে বইসা ট্যাকা গোনে আর আমারে মাইর-ধইর করে। আমার পাপের কামাই খায় আর আমারেই মাগী কইয়া গাইল দেয়। টানবাজারে থাকলে কবেই ওরে ছাইড়া দিতাম। কিন্তু এইহানে পারি না। স্বামী না থাকলে এই সমাজে চলা যায় না।"

সালমা মাসি (৫০) টানবাজারের একসময়কার প্রতাপশালী মাসি ছিলেন। তিনি এখন জীমখানা বস্তি এলাকায় ফুটপাতে ভিক্ষা করে জীবন চালাচ্ছেন। পাড়ার মধ্যে এবং বাইরেও তার অনেক সম্পত্তি ছিল। কিন্তু টানবাজার ভেঙে যাওয়ার পর ভিতরের সম্পত্তির মতো বাইরের সব সম্পত্তিও বেদখল হয়ে গেছে।

মঞ্জু সর্দারনী (৪২) যখন টানবাজারে ছিলেন তখন তার আন্ডারে ৪৫ জন মেয়ে ছিল। প্রতিদিন কমপক্ষে দশ হাজার টাকা আয় হতো। পুনর্বাসনের নামে টানবাজার থেকে উচ্ছেদের পর তিনি জীমখানা এলাকায় এসে বাসা ভাড়া করে থাকেন। দুই ছেলের একজন গার্মেন্টিসে আরেকজন হোসিয়ারীতে কাজ করে। মঞ্জু বললেন,"যখন টানবাজারে ছিলাম তখন দিনে দশ হাজার টাকা আয় করতাম; এখনতো সব ব্যবসাই বন্ধ। টানবাজার ভাঙার পর এই বস্তিতে আইসা উঠছি। আমার বাড়িতে লাখ লাখ টাকার মালপত্র, গয়না গাটি ছিল, কিছুই সাথে আনতে পারিনাই। টানবাজার ভাঙার সময় কইছিলো আমরা ভালো থাকুম। এইটারে কি ভাল থাকা কয়?"

মনোয়ারা, মায়া, শিউলীর মতো অনেক যৌনকর্মীর জীবনই এরকম করুণ কাহিনীতে ভরা। এরা সবাই এখন ভাসমান যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করছেন। কিন্তু একটা সময়ে তাদেরও ঘর ছিল, ছিল ন্যূনতম নিরাপত্তা। তখন নিজেরা ঘরে বসেই ব্যবসা চালাতে পারতেন। এখনকার চাইতে সামান্য হলেও ভালো জীবন যাপন করতে পারতেন। টানবাজার এবং নীমতলা যৌনপল্লী ভেঙে দেয়ার ফলে প্রায় সাত হাজার যৌনকর্মীর জীবনে নেমে এসেছে অসহনীয় দুর্ভোগ।

প্রথমবারের মত টানবাজার যৌনপল্লী উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চালানো হয় ১৯৯১ সালে। কিন্তু সে সময় যৌনপল্লীর বাড়ির মালিকরা যৌনকর্মীদের পক্ষে ছিলেন। যৌনপল্লী দুটো থেকে তারা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করতেন বলে নিজেদের স্বার্থেই এই দুটোকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৯৯ সালে উচ্ছেদের সময় তারা সেরকম কোনো সক্রিয় ভূমিকাই রাখেননি। কারণ উচ্ছেদের পেছনে ছিলেন নারায়ণগঞ্জের গডফাদার হিসাবে পরিচিত শামীম ওসমান এমপি। স্থানীয় যৌনকর্মীদের মতে দুটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার টানাপোড়নের মধ্যে পড়ে তাদের জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেছে।

১৯৯৯ সালে টানবাজার এবং নীমতলী যৌনপল্লী দুটো ভেঙে ফেলার সময় সরকারি হিসাবমতে সেখানে সাড়ে তিনহাজার যৌনকর্মী ছিল কিন্তু বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও যৌনকর্মীদের নিজস্ব সংগঠনগুলোর মতে এখানে প্রায় সাত হাজার যৌনকর্মী ছিল। পুনর্বাসনের নামে উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রায় সকল যৌনকর্মীকে খালিহাতে বের হয়ে আসতে হয়েছিল। যারা উচ্ছেদের আগেই বের হয়ে গিয়েছিলেন তারা কেউই পরে আর কোনো কিছু ফিরে পাননি। এক সময় যাদের হাতে কাঁচা টাকার ছড়াছড়ি ছিল আজকে তারাই রাস্তায় নেমেছেন। শুধু এই যৌনকর্মীরাই যে রাস্তায় নেমেছেন তা নয় তাদের সাথে সাথে নেমেছেন তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাদেরও জীবন।

উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীরা কেউ দেশের অন্যান্য যৌনপল্লীগুলোতে গিয়ে বাস করা শুরু করলেও বেশিরভাগই ভাসমান যৌনকর্মী হিসেবে বেঁচে আছেন। এর ফলে তারা মানসিক, অর্থনৈতিক নানা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। রাস্তায় কাজ করতে হয় বলে তাদের আয় যেমন কমে গেছে তেমনি থাকার নিরাপদ জায়গা নেই বলে হামলার শিকারও হচ্ছেন। এছাড়া পুলিশ আর স্থানীয় মাস্তানদের অত্যাচারতো রয়েছেই।

নারায়ণগঞ্জের ভাসমান যৌনকর্মীদের সাথে কথা বলে তাদের দুর্ভোগের এইসব কাহিনী জানা গেছে। ক্ষোভের সাথে এই যৌনকর্মীদের একজন বলছিলেন, "আমাদের ভাল জীবনের স্বপ্ন দেখাইয়া টানবাজার থেকে উচ্ছেদ করা হইছিল কিন্তু আমাদের ভাল জীবনটা কোথায় সেইটাইতো আমরা এখনো খুঁইজা পাইলাম না। যদি আগের পেশাতেই থাকতে হয় তাইলে আমাদের টানবাজারই ভালো। সেইখানে থাকলে আর নাহোক জীবনের সামান্য নিরাপত্তাতো পাইতাম।"

টানবাজার থেকে উচ্ছেদ হওয়া এইসব যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে 'অক্ষয়' নামের একটি সংগঠন। এটি যৌনকর্মীদেরই একটি সংগঠন। সংগঠনের নেত্রী কাজল নিজেও একসময় যৌনপেশার সাথে ছিলেন। তিনি এদের দূর্ভোগ সম্পর্কে বললেন,"আমরা চেষ্টা করি ওরা যেসব সমস্যায় পড়ে সেগুলো সমাধান করতে। আমাদের ক্ষমতা খুব সীমিত তারপরও চেষ্টা করি ওদের একটু সাহায্য করতে। আমাদের সংগঠনটা হওয়ার পর ওদের অবস্থা অনেক ভালো হয়েছে।"

হারিয়ে যাবে সিঅ্যান্ডবি ঘাট যৌনপল্লী!

—কবিতা

'বানান (ঢেউ) যেভাবে ছাড়তিছে তাতে এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমার ঘর নাও পাতি পারি' ফরিদপুর সিঅ্যান্ডবি ঘাট (স্থানীয়ভাবে পরিচিত 'সিএনবি ঘাট') যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের সংগঠন 'পদ্মা নারী কল্যাণ সংঘ'-এর কার্যকরী সেক্রেটারি কবিতা এভাবেই তাদের যৌনপল্লীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলছিলেন। গত চার-পাঁচ বছর ধরে চলতে থাকা অব্যাহত নদী ভাঙ্গনের মুখে ফরিদপুর সিএনবি ঘাট যৌনপল্লী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ১৩ জন বাড়িওয়ালীর প্রায় ৫০টির মত ঘর ভেঙ্গে গেছে। নদী ভাঙ্গনের মুখে যৌনপল্লীর মোট আয়তনের যে অর্ধেকটা এখনও টিকে আছে তাও ২/১ মাসের মধ্যে ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা করছেন যৌনপল্লীর সদস্যরা।

নদীর ভাঙ্গন থেকে কবিতার ঘরের দূরত্ব মাত্র হাত বিশেক। মাটির চাপ ভেঙ্গে পড়ার শব্দে সারারাত ঘুম হয় না তার। সব সময় একটি অজানা আশংকা তাড়া করে ফেরে কবিতাকে। নদী ভাঙ্গনে ভেঙ্গে যাচ্ছে সিএনবি ঘাটের আশেপাশের জনপদও। গত চার-পাঁচ বছরে বিস্তীর্ণ এই জনপদে নদী ভাঙ্গন প্রক্রিয়া যে অব্যাহতগতিতে চলছে তার ফলে তাদের পেশার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। চলতে থাকা এই সংকটকে আরো তীব্রতর করে তুলেছে সাম্প্রতিক সময়ের ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্টি হওয়া আবাসন সমস্যা। এই যৌনপল্লীর যে ৫০টির মত ঘর ভেঙ্গে গেছে সেখানকার যৌনকর্মীরা অন্যান্যদের সঙ্গে খুব কষ্ট করে থাকছেন। ভেঙ্গেপড়া ঘরের টিন খুঁটি বিক্রির অর্থ দিয়ে তাদের দিনযাপন করতে হচ্ছে। দু'জন বাড়িওয়ালী ইতিমধ্যে সিএনবি ঘাট ছেড়ে দৌলতদিয়ায় চলে গেছেন।

ভাঙ্গনের কারণে খদ্দেরও অনেক কমে গেছে। এই যৌনপল্লীর খদ্দেরদের অধিকাংশই আশেপাশের গ্রামের মানুষ সাপ্তাহিক গরুর হাটে আসা ব্যবসায়ী এবং ট্রাক ড্রাইভার। খদ্দের কমতে কমতে এখন এমন একটি পর্যায়ে এসেছে যে খদ্দেরের দেখা পাওয়াটাও তাদের জন্য একটি সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবিতার মতে এখন গড়ে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ জন খদ্দের আসে তাদের যৌনপল্লীতে, প্রায় আড়াই'শ জন যৌনকর্মীর প্রয়োজনের তুলনায় যা নিতান্তই কম। অনেক সময় খদ্দের এ পল্লীতে এসে নদীর ভাঙ্গন দেখে ভয়ে কোনো ঘরে না ঢুকেই চলে যায়। বাড়ীওয়ালীরাও তাদের ঘর ভাড়া নেওয়া মেয়েদের চাপ দিচ্ছে বকেয়া ভাড়াসহ বর্তমান ভাড়া দেয়ার জন্যে। বাড়ীওয়ালীদের আশংকা বাড়ি ভেঙ্গে গেলে তারা আর ভাড়া আদায় করতে পারবেন না।

যৌনপল্লীর মেয়েরা কবিতার উপর চাপ সৃষ্টি করছেন তাদের সমস্যা সমাধানে কিছু একটা করার জন্যে। তিনি এ বিষয়টি নিয়ে অনেক জায়গায় আলাপ-আলোচনা করেছেন। জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে তাদের নিয়ে কাজ করছে এমন অনেক এনজিও'র কাছেও বিষয়টি তিনি উত্থাপন করেছেন। এখনও পর্যন্ত কোনো পক্ষ থেকে তেমন কোনো সাড়া মেলেনি। একদিকে নিজের ঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা, অন্যদিকে পদ্মা নারী কল্যাণ সংঘের কার্যকরী সেক্রেটারি হিসাবে যৌনকর্মীদের সমস্যার সমাধান, এ দু'টি বিষয় নিয়ে কবিতার প্রত্যেকটি দিন কাটে উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে। এ পল্লী ভেঙ্গে গেলে কোথায় যাবেন, কি করবেন তা এখনও তারা ঠিক করতে পারেননি। আপাতত মেয়েদের তিনি এখানে থাকতে বলছেন। কবিতার দাবি সরকারের কাছ থেকে খাস জমি পেলে তারা সেখানে থাকতে পারতেন। পাশাপাশি অন্য কোনো কাজ করার সুযোগ পেলে তারা কিছুটা নিশ্চিত জীবন-যাপনও করতে পারতেন।

সিএনবি ঘাট যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের অনিশ্চিত জীবনটাকে ফের একটি নতুন অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে এই নদী ভাঙ্গন। নদী ভাঙ্গনের কারণে খদ্দের আসা কমে যাওয়ায় বিপদে পড়েছেন বয়স্ক যৌনকর্মীরাও। তাদের কাছে আগের মত আর খদ্দের আসে না। ছেলেমেয়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাদের প্রতিনিয়ত হিমসিম খেতে হচ্ছে। সবসময়ে একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটাতে হয় তাদের।

২০০৩ সালে এই পল্লীতে ফেলু নামের একটি কিশোরী ক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করে। স্কুল থেকে ফিরে ফেলু তার মার কাছে ভাত চাইলে তার মা তাকে ভাত রান্না করে খেতে বলে। ভাত রান্না করতে যে সময় দরকার ততক্ষণ দেরি করা ক্ষুধার্ত ফেলুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে কারণে আত্মহত্যার পথটিকেই সে বেছে নেয়। বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে ফেলুর মায়ের কাছে খদ্দের আসাও কমে গিয়েছিল।

মরেও শান্তি নেই ফেলুদের। এ সমাজের মানুষজন তাদের লাশ কবর দিতে দেয় না। লাশ ভাসিয়ে দেয়া হয়, নতুবা শ্মশানে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়। শ্মশানে মাটি চাপা দিতেও টাকা দিতে হয় শ্মশানের দায়িত্বে থাকা মানুষজনদের। তাদের কোনো অবিভাবক নেই এই

কর্মশালায় কথা বলছেন কবিতা।

অভিযোগে অনেক সময়ে নিহত যৌনকর্মীর লাশও পুলিশ ফেরত দেয় না। বছর চারেক আগে এই পল্লীতে মনি নামে নিহত এক যৌনকর্মীর ক্ষেত্রে এমন ঘটনাই ঘটেছিল বলে অভিযোগ করেন এই যৌনপল্লীর যৌনকর্মীরা।

নদী ভাঙ্গনে যৌনপল্লী টিকে থাকবে কিনা তা যেমন জানা নেই কবিতাদের, তেমনি জানা নেই এই পল্লী ভেঙ্গে গেলে তারা কি করবে। এক অনিশ্চিত নিরাপত্তাহীন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দিন কাটছে তাদের।

অনুলিখন: শেখর কান্তি রায়

একাকিত্বের জীবন আমার

—কথা

আমি হিজড়া হলেও সবসময় মেয়ে হয়ে চলাফেরা করতে ভালো লাগে। বাসায় আমার হিজড়া পরিচয় কেউ জানে না। আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীরা যাতে আমার এই হিজড়াসুলভ আচরণ ও পরিচয় জানতে না পারে সে জন্য তাদের সামনে ছেলে পরিচয়ে থাকতে হয়। তখন আমার ভীষণ কষ্ট লাগে কিন্তু কিছু করার উপায় নেই।

আমি ইভান আহমেদ কথা। পেশায় আমি একজন নৃত্যশিল্পী। ১০ জুলাই আমার জন্ম দিন। আমার গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুরে। মা-বাবা, দুই ভাই এবং চার বোন নিয়ে বিরাট পরিবার আমাদের।

ছোটকাল থেকেই ছেলেদের সাথে খেলাধুলা এবং চলাফেরা করতাম। ছেলে বন্ধুদের সাথেই স্কুলে যেতাম। বয়স বাড়ার সাথে সাথে হঠাৎ আমার শরীরের পরিবর্তন লক্ষ্য করি। বুঝতে পারি আমার শরীরের গঠন অন্য কোনো ছেলে বা মেয়েদের মতো নয়। তখন থেকেই আলাদাভাবে জীবন গড়ার চিন্তা শুরু করলাম।

পড়ালেখায় ভালো ছিলাম বলে কষ্ট করে হলেও প্রথমে ঢাকা মতিঝিল মডেল হাই স্কুল থেকে এসএসসি এবং পরে

কর্মশালায় আলোচনা করছেন কথা।

নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করি। দুই জায়গাতেই আমার আচরণ নিয়ে ছাত্র বন্ধুরা নানারকম হাসি ঠাট্টা এবং টিটকারি মারতো। তাদের আচরণের জবাব না দিয়ে নিরবে সব সহ্য করতাম। যদিও সেই সময় খুব কষ্ট লাগতো আমার।

যখন আমি বুলবুল ললিত কলা একাডেমির তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তখন কোলকাতা থেকে সাধারণ এবং লোকনৃত্যের উপর প্রথম পুরস্কার পাই। একই সময় আমি শিশু একাডেমির 'রুপালী তারার মেলা' নামে একটি সংগঠনের প্রশিক্ষক হিসাবে নৃত্য শিখাতাম। কিন্তু ছাত্রীদের অভিভাবকরা বলতে লাগলেন যে, আমাদের টিচারটার স্বভাব এবং আচরণ হিজড়াদের মতো। তখন রাগে এবং অপমানে শিশু একাডেমির চাকুরি ছেড়ে দিই। সেখান থেকে এসে 'কথা-কলি শিশু কিশোর সংগঠন' নামে আলাদা একটি নৃত্যের স্কুল খুলি। সেখানেই নিজে স্বাধীনভাবে ছাত্রীদের নৃত্য শিখাতাম। দেশের বরেণ্য নৃত্য শিল্পী মুনমুন আহমেদের সাথে একটি সংগঠনের প্রশিক্ষক হিসাবে ১৬ মাস কাজ করেছি।

যৌনকাজ করতে গিয়ে নারী যৌনকর্মীদের মতো হিজড়াদের নানারকম স্বাস্থ্য সমস্যা এবং ঝুঁকি দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের এ সমস্যা নারী কর্মীদের তুলনায় মারাত্মক হয়। কিন্তু এসব সমস্যার প্রতিকারের জন্য তেমন কোনো সংস্থা এগিয়ে আসে না। এসব কথা ভেবেই কেয়ার নামক সংস্থায় এইডস্/এইচআইভি প্রোগ্রামে ৬ বছর কাজ করি।

হিজড়াদের নিয়ে কোনো মানবাধিকার সংস্থা কাজ করে না। তাই নিজেদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'সচেতন শিল্পী সংঘ' নামে একটি সংগঠনের সাথে যৌথভাবে কাজ করি। তারা আমাদের অধিকার এবং সচেতনতা প্রদানের জন্য নানারকম প্রশিক্ষণ দেয়। এই সংগঠন বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত। বর্তমানে আমি এই সংগঠনের সভাপতি। এই সংগঠনের মোট সদস্য ৪৫৫ জন। সংগঠনের ২০ জন শিল্পী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম নাচের প্রোগ্রামে যেমন বিয়ে বা গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে যায়। সেখানে ধ্রুপদী, লোক এবং সাধারণ নৃত্য প্রদর্শন করা হয়।

হিজড়াদের প্রতিনিয়ত নানারকম যৌন নিপীড়ন সহ্য করতে হয়। আমার ওপর যৌন নিপীড়নের একটা ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। একদিনের ঘটনা, যেদিন মিলেনিয়াম রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে বাধন নামে একটি মেয়েকে কিছু বখাটে যুবক লাঞ্ছিত করে। সেই রাতেই বাংলা একাডেমির সুইপার কলোনিতে কয়েকজন স্টুডেন্ট আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর আমাদেরকে কলোনির সিঁড়িতে নিয়ে তিনজন ছেলে তাদের সাথে যৌনকাজ করতে বলে। আবার বলে, তোদের সাথে

বেল্ট পিটা দিয়ে যৌনকাজ করতে ভালো লাগে। জানিস না ভিলেনরা নায়িকাদের কীভাবে মারে। আমরা আজকে তোদের ছিড়াবিড়া করে খামু। তখন আমি বললাম আপনেরে দেখতে মনে হয় ভালো ঘরের ছেলে কিন্তু আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন কেন ? তখন ওরা বলে, চুপ কর বেশি কথা শুনতে চাই না। যা করবার কইছি তাই করবি। এভাবেই প্রতিনিয়ত নানারকম তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হতে হয়। জানি না কবে এ থেকে রেহাই পাবো। ('হিজড়া' শব্দটি যদিও আমার পছন্দের নয় তবুও এখানে ব্যবহার করছি পাঠকের সুবিধার্থে। আমি হিজড়া শব্দটিকে গালি হিসাবে গণ্য করি। বস্তুত নারী ও পুরুষের মাঝামাঝি প্রকৃতির মানুষকে 'তৃতীয় প্রকৃতি'র মানুষ বলাই শ্রেয়)। *অনুলিখন: সুবোধ এম বাস্কে*

চলার পথে বাধা

—জয়া

রাস্তাঘাটে এবং বাসে চলার পথে প্রতিনিয়ত নানামুখী সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে হিজড়া যৌনকর্মীদের। বাসের হেলপার, কন্ট্রাকটার এবং ড্রাইভার থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রীরাও আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। মাঝে মধ্যে গুতা মারে। প্রতিবাদ করলে বলে তোগোর কী ক্ষতি হয়? তোগো গুতা দিলে আমাদের আনন্দ লাগে। অশালীন ভাষায় বিভিন্ন ধরনের কথা বলে। এমনই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের মতো হিজড়া যৌনকর্মী সবার।

আমার নাম জয়া শিকদার। আমার তিন ভাই এবং দুই বোন আছে। পরিবারের আমি তৃতীয় সন্তান। আমার বাড়ি পটুয়াখালী জেলায়।

২০০২ সালের কথা। সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বাসে ঢাকা আসছিলাম। গাবতলীতে নেমে টেম্পু করে মহাখালী যাচ্ছিলাম, পাশে এক ভদ্রলোক বসা। আমিও নারীর মতো। হঠাৎ বাস স্টান্ডের হেলপার, ড্রাইভার এবং কণ্ডাকটার টিটকারি মারতে থাকে এবং বলতে শুরু করে ঠাসা মালটা আসছে। তখন রাত আনুমানিক ১০টা। হঠাৎ দুইতিন জন এসে বললো ও সুন্দরী কোথায় যাচ্ছ? তখন বললাম যেখানেই যাই তোমাদের কী দরকার। তারা বলে আমাদের দরকার আছে।

যৌন কাজ করার সময় খদ্দের দ্বারা নির্যাতিত হই নিউ এয়ারপোর্ট রোডে। এক ট্রাক ড্রাইভার ৫০০ টাকার নোট হাতে দিয়ে বলে সামনে কাজ করে নামিয়ে দিব। এই বলে সে আমাকে ট্রাকে উঠিয়ে আশুলিয়াতে নিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছার পর আমাকে উলঙ্গ করে প্রথমে ড্রাইভার পরে হেলপার কাজ করে। কাজ শেষ করার পর তার দেয়া টাকা কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

এই লাইনে আসতে হলে প্রথমে গুরুর দীক্ষা নিতে হয়। গুরুর দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বাধন হিজড়া সংগঠনে কাজ করি। ১৯৯৭ সালের দিকে প্রিয়া নামের একজন হিজড়ার সাথে যৌন পেশায় কাজ করতে নামি। প্রথম যেদিন কাজ করতে যাই সেই দিন আমি তার সাথে কড়া করে মেকাপ করে নিজেকে সাজালাম এবং ভাবতে লাগলাম একজন নায়িকার মতো। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতাম আমি নায়িকা মনিষা। যখন এয়ারপোর্ট এলাকার পার্কে গিয়ে দাঁড়ালাম দেখি সেখানে আমাদের মতো আরও হিজড়া যৌনকর্মী সুন্দর করে সেজে দাঁড়িয়ে খদ্দের নিচ্ছে। রাতের অন্ধকারে সোডিয়াম লাইটের আলোতে একেক জনকে দেখে মনে হলো পরীর মতো।

সেখানে এই যৌন কাজ করতে এক সময় পরিচয় হয় সামসুমন নাহার ওরফে সুন্দরী নামের এক নারী যৌনকর্মীর সাথে। তার সাথে আমার খুব ভাব হয়। সে কেয়ার নামের এক সংস্থায় এইচআইভি প্রোগ্রামে কাজ করতো। তার সাথে আমি কাজ নিলাম নারী যৌনকর্মীদের এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতন করতাম। এদের সচেতন করতে গিয়ে হিজড়াদের কথা মনে হতো। তারাওতো যৌন কাজ করে, তাদেরও স্বাস্থ্যসেবা দরকার। এক সময় কেয়ারের সাথে এই বিষয়ে কথা বললে তারা বলতো আমাদের নারী যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ আছে কিন্তু তোমাদের নিয়ে কীভাবে কাজ করবো। এইভাবে বলতে বলতে ১৯৯৯ সালে কেয়ার হিজড়াদের জন্য এইচআইভি, এসটিডি নিয়ে কাজ করা শুরু করে এবং মহাখালী আইসিডিডিআরবি ৩০ জন হিজড়ার রক্ত পরীক্ষা করে তাতে ২৯ জনের সিফিলিস পজিটিভ ধরা পড়ে। সেই থেকে হিজড়ারা বলতে শুরু করে আমাদের কনডম দরকার। আমরা

জয়া।

পুলিশ, মাস্তান, কাস্টমার, পাবলিক ও পরিবার দ্বারা নির্যাতিত হই। এই সব নির্যাতনের কথা আমরা কোথাও বলতে পারতাম না।

কেয়ার ট্রেনিং ও মিটিং-এ গেলে তাদের কাছে নানা সমস্যার কথা বলতাম। তখন তারা বলতো আপনাদের সমস্যা আপনারাই সমাধান করবেন। এজন্য আপনাদের দরকার সংগঠন। আমরা ভাবতাম হিজড়াদের আবার কিসের সংগঠন। এমনিতেই বিভিন্ন নির্যাতনে বাঁচি না আবার সংগঠন করে ঝামেলায় পড়ব নাকি। তারপর আমরা কিছুদিন দুর্জয় নারী সংঘের সদস্য হয়ে রইলাম। ২০০০ সালে কোলকাতা মিলেনিয়াম মেলায় গিয়ে দেখলাম সেখানে পশ্চিমবঙ্গের দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি অনেক বড় মেলার আয়োজন করেছে। তারা যৌনকর্মীদের অধিকার নিয়ে কথা বলে। এইসব দেখে আমাদের মনে জাগলো আমরা কোলকাতা থেকে ঢাকা গিয়ে সংগঠন তৈরি করবো। এরপর ২০০০ সালের ৫ নভেম্বর বাধন নামের সংগঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর আমরা সমাজসেবা অফিসে যাই রেজিস্ট্রেশনের জন্য। কিন্তু সমাজসেবা হিজড়া সংগঠন হিসাবে রেজিস্ট্রেশন দিতে চায় না। তারা বলে হিজড়াদের কীসের সংগঠন? আপনারা সংগঠন দিয়ে কী করবেন? এরপর তাদের উপপরিচালকের কাছে গিয়ে যখন সব বললাম তখন তিনি আমাদের সব কথা শুনে আমাদের সহযোগিতা করলেন। ২০০৩ সালে বাধন হিজড়া সংঘ নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে বাধনের সদস্য ২৮০ জন। *অনুলিখন: সুবোধ এম বাস্কে*

মমতাজ।

সমঝোতার মাধ্যমে পটুয়াখালী যৌনপল্লী উচ্ছেদ বন্ধ করা গেল

—মমতাজ বেগম

২০০৪ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। পটুয়াখালী শহরের যৌনপল্লী উচ্ছেদের জন্য ইমাম সাহেব ও রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে গঠন করা হয় একটি উচ্ছেদ কমিটি। এলাকার বিভিন্ন পেশার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও ছিলেন এই কমিটিতে। এদের দাবি যৌনপল্লী শহরের পরিবেশ নষ্ট করছে। তাই যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ করা দরকার। পটুয়াখালী যৌনপল্লী থেকে এ সংবাদ পাঠানো হয় যৌনকর্মীদের সংগঠন সেক্সওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ'র সভানেত্রী হিসাবে আমার কাছে। যৌনকর্মীদের প্রত্যাশা ছিল পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে তাদের যেন উচ্ছেদ করা না হয়।

এ সংবাদটি পাওয়ার পর আমি যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করে যেসব প্রতিষ্ঠান তাদের সবাইকে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাই। তাদের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৮৬ টি মানবাধিকার সংগঠনের জোট সংহতি ঢাকায় একটি মিটিং-এর আয়োজন করে। এই মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটিও গঠন করা হয়। যৌনকর্মীদের সংগঠন দূর্জয়, উল্কা, নারী মুক্তির পাশাপাশি বিডব্লিউএইচসি, কেয়ার বাংলাদেশ, কনসার্ন বাংলাদেশ-এর মতো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এই কমিটির সদস্য ছিল। এই প্রস্তুতি কমিটি পটুয়াখালীতে গিয়ে যৌনকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে। জেলাপ্রশাসক থেকে শুরু করে পুলিশসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও তাদের কথাবার্তা হয়। পরবর্তীতে পটুয়াখালী বার কাউন্সিলের সঙ্গেও তাদের এ বিষয়ে আলোচনা হয়। সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বার কাউন্সিল এবং সংহতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে উচ্ছেদ প্রতিরোধ করতে হলে একটি কমিটি থাকা দরকার। এই প্রয়োজনীয়তার তাগিদ থেকেই এডিআরসি নামে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। বার কাউন্সিল, সংহতি, সেক্সওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ, দূর্বার এবং সমমনা আরও অনেক সংগঠন এই কমিটির সদস্য ছিল।

শুরু থেকেই এ কমিটি দাবি জানাতে থাকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কোনোভাবেই যৌনকর্মীদের উচ্ছেদ করা যাবেনা। এই দাবীকে সামনে রেখে এই কমিটি পটুয়াখালীর সংসদ সদস্য এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীসহ জেলা প্রশাসক, এলাকার কমিশনার এবং পুলিশের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসে। সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমেও বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এই কমিটি উচ্ছেদ কমিটির সঙ্গেও একটি সমঝোতায় আসার জন্যে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসে। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে কান্দুপট্টি, টানবাজার, মাগুরা যৌনপল্লীর উচ্ছেদ করার ফলে যৌনকর্মীরা যেভাবে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে পটুয়াখালী যৌনপল্লী উচ্ছেদ করলে একই ফলাফল হবে, এটা উচ্ছেদ কমিটিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। এ ক্ষেত্রে এডিআরসি কমিটি বেশ সফলও হয়। উচ্ছেদ কমিটি এডিআরসি কমিটির দাবির প্রতি সম্মতি

জানিয়ে তাদের পরামর্শ দেয়, এনজিওরা যৌনকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্য পেশায় যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

তখন থেকে সংহতি বিভিন্ন এনজিও-র আর্থিক সহায়তায় যৌনকর্মীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কনসার্ন বাংলাদেশের সহায়তায় যৌন পল্লীর মেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বয়স্ক শিক্ষা প্রদান বিষয়ক প্রকল্প, বিডব্লিউএইচসি'র সহায়তায় বাচ্চাদের লেখাপড়া ও মেয়েদের ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রকল্প।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আওতায় এসে যৌনপল্লীর মেয়েরা নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। স্থানীয় বেশ কিছু সংগঠন তাদের এ বিষয়ে সহযোগিতা করছে যাতে তারা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য নিজেরাই বাজারজাত করতে পারে। একটি সমঝোতামূলক সমাধানের কারণে পটুয়াখালীর যৌনপল্লী এখনও টিকে আছে। যৌনকর্মীরাও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে বিকল্প পেশায় যাওয়ার আশায় দিন কাটাচ্ছে। *অনুলিখন: শেখর কান্তি রায়*

'মরলে যেন জানাযা হয়'

—পারু

আমার নাম পারু। বাড়ি উত্তরাঞ্চলের এক জেলায়। সংসারে আমরা তিন ভাইবোন। আমি ছিলাম মেজো। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত স্কুলে পড়ছি। বাবার সাথে মাঠে কাজ করতাম। সংসারে অভাব ছিল। সুখও ছিল। আমার যখন সতের-আঠার বছর বয়স তখন দেশেরই এক লোক কাজ দেবে বলে আমাকে দিনাজপুরে নিয়ে আসে। তারপর সে আমাকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। সেখানে খুব অত্যাচার করত। পালিয়ে আমি এক সেমাই মিলে কাজ নেই। সেই মিল মালিকও বিয়ের আশ্বাসে আমার সাথে খারাপ কাজ করতে চায়। আমি সেখান থেকে ঐ রাতেই পালিয়ে রেল স্টেশনে চলে আসি।

কিন্তু এখানেও স্টেশনের কিছু ছেলে জোর করে আমাকে হোন্ডায় উঠিয়ে নেয়। আমি হোন্ডা থেকে ঝাঁপ দিয়ে চিৎকার করলে তারা আমাকে ফেলে রেখেই চলে যায়। ঐ অবস্থায় এক ব্যাংক ম্যানেজারের বাসায় আশ্রয় পাই। কিন্তু ওনার পরিবারের লোকের চাপে থাকতে না পেরে আমি আবার শহরের যৌনপল্লীতে চলে আসি। সেখানে থেকে একসময় যশোর যৌনপল্লীতে এসে দুইতিন বছর কাজ করি। তারপর দিনাজপুরের ঐ পাড়া উচ্ছেদ হলে, এই দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে এসে আজ ১৭ কী ১৮ বছর ধরে কাজ করছি।

এখানে আসার পর প্রথম প্রথম দু'তিন বছর আয় কম হত। হাতে টাকা থাকতো না, সর্দারনী নিয়ে যেত। এখন আমি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। মাসে চার-পাঁচ হাজার টাকা আয় করি। কিছু টাকা জমাই সমিতিতে। আমাদের মুক্তি মহিলা সমিতির নির্বাহী কমিটির কর্মচারী সদস্য আমি।

আমাদের এখানকার প্রধান সমস্যা হলো পানি, বিদ্যুৎ এবং মৃত্যুর পর জানাযা। প্রতিদিন একটা বাল্ব জ্বললে ৫ টাকা, টিভি ৩ টাকা, রেডিও ২ টাকা আর ফ্যান চললে ১০ টাকা দিতে হয়। আগে প্রতিদিন ১৮ টাকা দিলেই চলতো। এখন বিদ্যুতের লাইন আনতে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা লাগে। তারপর আছে মাসে মাসে মিটার ভাড়া। টিউবয়েলের পাশেই ল্যাট্রিন। গোসলের কাজ ছোট একটু জায়গার মধ্যেই সারতে হয়। বৃষ্টি নামলে ঘরে ময়লা, কাদা, পানি জমে যায়। একটা ড্রেন করে দিলে ময়লা-পানি ক্ষেত্রের মধ্যে চলে যেত। কিন্তু মালিক কান দেয় না।

কোনো যৌনকর্মী মরে গেলে মওলানা বলেন, 'জানাযা হইব না, তোরা পাপ কাজ করছস'। এ পর্যন্ত একজনেরও জানাযা, কবর হয়নি। দুই বছর আগে আমরা কবর স্থানের জায়গা পেয়েছি, তবে তা আলাদা। সমাজের গোরস্থানে আমাদের জায়গা নেই। তবে এখন আমরা স্যান্ডেল পরে বাজারে যেতে পারি, মাথায় কাপড়ও দিতে পারি।

দৌলতদিয়ার এই পল্লীতে ৬০০ ঘরে প্রায় দুহাজার মেয়ে কাজ করে। প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গা থেকে 'মা' একটি মসজিদ উঠাব, মাদ্রাসা করব, স্কুল হবে' বলে লোকেরা টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু স্কুলে তো আমাদের ছেলেমেয়েদের জায়গা হয় না। আমাদের সাথে স্থানীয় লোকেরা এখন ভাল ব্যবহার করে, সাহায্য করে। চাঁদাবাজি, মাস্তানি কমেছে। খদ্দেররা এখন আগের চেয়ে সচেতন হয়েছে। কাজের সময় সহযোগিতা করে, অত্যাচার কম করে। কনডম নিতে বললে রাজি হয়। আমরা নিজেরা প্রতি বছর রক্ত পরীক্ষা করাই। এইচ আইভি/এইডস্ এর বিপদ সম্বন্ধে জানছি। ঝুঁকি নেই না, সর্তক থাকি।

জীবনটাকে প্রতিদিন আমরা বাজারের দামে কেনাবেচা করি। তাই মূল্যটা আমরা ভালই টের পাই। সবকিছুর দাম বাড়ছে কিন্তু আমাদের দাম বাড়েনি। আমরা অস্থায়ী বলে ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধাও পাই না যে অন্যকিছু করব।

আমি মুক্তি মহিলা সমিতিতে কাজ করি ২০০২ সাল থেকে। এখানে বয়স্ক শিক্ষা, জীবন দক্ষতা, শিশু বিকাশ কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকল্পে যৌনকর্মীরা অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। আমি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে বাচ্চাদের খেলাধূলা, ছড়া শেখানোর কাজ করি সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত। তারপর সমিতির কালেকশন, মোটিভিশনের কাজ করি এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত। তারপর চলে অন্যান্য কাজ। *অনুলিখন: দেবাশীষ মজুমদার*

জামালপুর যৌনপল্লী

—ময়না

জামালপুরের রানীগঞ্জবাজার যৌনপল্লী স্থাপিত হয় ১৮৭৬ সালে। সক্রিয় যৌনকর্মীর সংখ্যা ১৯৫ জন এবং সর্দারনী ৪৫ জন। মোট ১১টি বাড়ীর ১৭৯ টি কক্ষে এরা বসবাস করছে। একটা মেয়ে যখন নতুন আসে তাকে নাম লিখাতে ব্যয় করতে হয় আট-দশ হাজার টাকা। সে আসে খালি হাতে, এত টাকা দেয়ার সামর্থ্য তার থাকে না। তখন তাকে টাকা ধার দেয় সর্দারনীর লোক। এক্ষেত্রে প্রতি হাজারে দৈনিক সুদ দিতে হয় ৩০ থেকে ৪০ টাকা। তাছাড়াও ঘর ভাড়া বেশি এবং লাইট, ফ্যান, সিডির জন্য আলাদা আলাদা বিদুৎ বিল দিতে হয়, যা মাত্রাতিরিক্ত। এটা কমানো প্রয়োজন। এছাড়া ঋণের সুদ ও শর্ত সহজ করতে হবে।

এখানে যৌনকর্মীদের সংগঠিত করার জন্য গঠিত হয়েছে সৌরভ সমাজ কল্যাণ সংস্থা। সংস্থাটি ২০০৩ সালে গঠিত হলেও বর্তমানে কোনো ফান্ড নেই। এছাড়া যৌনপল্লীতে কাজ করছে পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড টেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)। পিএসটিসি যৌনপল্লীতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। অপরাজেয় বাংলা যৌনপল্লীর শিশুদের নিয়ে কাজ করলেও অনেক শিশু এখনো যৌনপল্লীতে অবস্থান করছে। এনজিওগুলো উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করলেও উন্নয়নের সুবাতাস বইছে ধীরে। *অনুলিখন: বীথি*

ময়মনসিংহ যৌনপল্লী: অবস্থার পরিবর্তন হলেও যৌনকর্মীরা অবহেলিত

—মনিরা

নুরজাহান (৩০) ময়মনসিংহ যৌনপল্লীর একজন যৌনকর্মী। গত ২৫ মে সকালে নুরজাহান তার বাবুকে নেশার জন্য টাকা না দেওয়ায় বাবু তাকে খুব মারে। এতে তার এক চোখ গুরুতরভাবে ক্ষতিগস্ত হয়। চোখের পাশে আটটি সেলাই দিতে হয়। ডাক্তার এ সময়ে পুলিশ কেসের জন্য রিপোর্ট লিখে দেন। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছুটির আগে ডাক্তার যখন জানতে পারেন যে নুরজাহান একজন যৌনকর্মী তখন ডাক্তার পুলিশ কেসের রিপোর্টটি দেননি। ডাক্তার পুলিশ কেসের রিপোর্ট না দেয়ায় যৌনকর্মীরা এ ব্যাপারে মামলা করতে পারেনি। এভাবেই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সবসময় নিগৃহীত হচ্ছে যৌনকর্মীরা। যৌনকর্মীদের অবস্থার পরিবর্তনে ময়মনসিংহের যৌনপল্লীতে কাজ করছে সৌরভ নারী কল্যাণ সংঘ। 'সৌরভ' ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালে রেজিস্ট্রেশন পায় এবং ২০০৫ সালে কনসার্ন নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য দেয়। আগে আমরা পথে চলতে পারতাম না, এখন পারছি। ডিসিসহ বড় বড় লোকের সঙ্গে মিটিং করতে পারি, প্রতিবাদ করতে পারি। বিভিন্ন টিকাদান কর্মসূচিতে সিভিল সার্জন ভলান্টিয়ার হিসাবে আমাদের নিয়োগ করেন। তবে অনেকের অসহযোগিতায় খুব কষ্ট লাগে।

'কনসার্ন'-এর সহযোগিতায় 'সৌরভ' এ পর্যন্ত চল্লিশজন শিশুকে ওয়ার্ল্ড ভিশনে লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ১৫ জন শিশুকে প্রি-স্কুল পর্যায়ে পড়ানোর পর প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করেছে এবং ১৫ শিশুকে প্রি-স্কুল পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া তিন যৌনকর্মীকে ড্রাইভিং এবং দশজনকে সেলাই শিক্ষা দিয়েছে। এছাড়াও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে এবং দুইজনকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা চলছে। *অনুলিখন: বীথি*

ময়না।

(বাম দিক থেকে) রাজিয়া ও মনিরা।

নিজের মানুষও প্রতারণা করে

—হাজেরা

সমাজে মানুষ আমাদের খারাপ বলে, কিন্তু আমরা যাদের ভালবেসে সব কিছু উজাড় করে দেই তারা কীভাবে আমাদের সাথে বেইমানী ও প্রতারণা করে? অনেক যৌনকর্মী আছে যারা নিজের স্বামী (বাবু) দ্বারা নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়ে জীবন দিয়েছে। যেমন দিয়েছে দূর্জয় নারী সংঘের সদস্য বেবী (মাঠকর্মী ছিলো)।

বেবী ছিল রাস্তার একজন যৌনকর্মী। যৌন পেশায় এসে বেবী পিন্টু নামের একটি ছেলেকে ভালোবাসে। তার যৌন পেশার যত আয় এই পিন্টুর পিছনে ব্যয় করে। পরে দূর্জয় নারী সংঘের মাঠকর্মী হিসাবে কাজ করে যত টাকা পেতো সবই এই পিন্টুর পিছনে ব্যয় করেছে, আমরা যারা বেবীর কাছাকাছি থাকতাম তারা এর সাক্ষী।

পিন্টু ছিল সেগুন বাগিচার মাইক্রো বাসের ড্রাইভার এবং বেবী ছিল কাকরাইল এলাকার একজন যৌনকর্মী। সেইখান থেকে বেবী ও পিন্টুর ভালোবাসা হয়। প্রায় পাঁচ-ছয় বছর তারা একে অন্যকে ভালোবাসতো। যখন বেবী পিন্টুকে বিয়ের কথা বলেছে তখন থেকে পিন্টু দূরে সরে যেতে থাকে। এই দিকে বেবী তার নতুন সংসার করবে বলে ঘরের নতুন মালামাল কিনতে থাকে। পিন্টুকে বেবী তাঁর পরিবারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার স্বামী হিসাবে। অনেক সময় পিন্টু বেবীর মার কাছ থেকেও টাকা আনতো। যেদিন বেবী খুন হলো তার ৫ দিন আগে পিন্টু বেবীর মার কাছ থেকে ৫,০০০ টাকা আনে গাড়ির কাজ করার কথা বলে।

বেবী নতুন বাসা নিয়েছিল মালিবাগ এলাকায়। সেই বাসায় পিন্টুও যেত মাঝে মাঝে। ৬ মে (২০০৬) রাতে খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। কাকরাইলের অনেক যৌনকর্মী জানে সে রাতে পিন্টু ও বেবী একসাথে বাসায় গিয়েছে। বেবী যৌনকর্মীদের বলেছিল যে সেদিন পিন্টু তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু সে রাতেই বেবী খুন হলো।

যে বাসা বেবী ভাড়া নিয়েছিল সেই বাসার ম্যানেজার বলেছেন রাতে তিনি ঘরের সামনে তিন জোড়া জুতা দেখেছেন। একজোড়া মেয়ের এবং দুইজোড়া পুরুষের। কিন্তু সকালে শুধু মেয়ের জুতা দেখেন। ম্যানেজার মনে করেছিলেন রাতে তার কোনো আত্মীয় এখানে এসেছে। পরের দিন সকালে একজোড়া জুতা দেখে ও বাহির থেকে ঘরের দরজা বন্ধ দেখে তার সন্দেহ হয়। তিনি দরজা খুলে মৃত বেবীকে দেখতে পান।

হাজেরা।

এই হলো বেবী নামের এক যৌনকর্মীর করুণ পরিণতি।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, তাই যদি হয় কেন আমরা যৌনকর্মীরা সমাজের চোখে এত খারাপ? যাদের আমরা মনে প্রাণে ভালবাসি তারা আমাদের সাথে প্রতারণা করে?

সোনিয়ার মৃত্যু ও আমাদের অধিকার

"আমরাও মানুষ আর তাই মৃত্যুর পর আমাদেরও মাটি পাওয়ার অধিকার আছে। আমাগো ট্যাকায় মসজিদ, মন্দির হইতে পারলে আমাগো মৃত্যুর পর হুজুররা আমাগো জানাযা পড়াইতে পারব না কেন?" ক্ষোভের সাথে কথাগুলো বললেন ফরিদপুরের যৌনকর্মীদের নিয়ে গঠিত 'জয় নারী কল্যান সমিতির' সভানেত্রী আলেয়া বেগম। ফরিদপুর যৌনপল্লীতে সোনিয়া (৩০) নামের এক যৌনকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যুর পর ফরিদপুর প্রেসক্লাবে গত ২৫ মে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

গত ৮ই মে ফরিদপুর যৌনপল্লীর একটি ঘর থেকে ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পুলিশ সোনিয়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে। সোনিয়ার পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ঘটনার রাতে সোনিয়ার 'বাবু' দেলোয়ার টাকার জন্য তাকে মারধোর করে চলে যায়। পরদিন সকালে পরিবারের সদস্যরা তার মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। তাদের অভিযোগ দেলোয়ারের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই সোনিয়া আত্মহত্যা করেছে।

বেঁচে থাকাকালীন নানা অবিচার আর বঞ্চনার শিকার সোনিয়া মৃত্যুর পরও কোনো সুবিচার

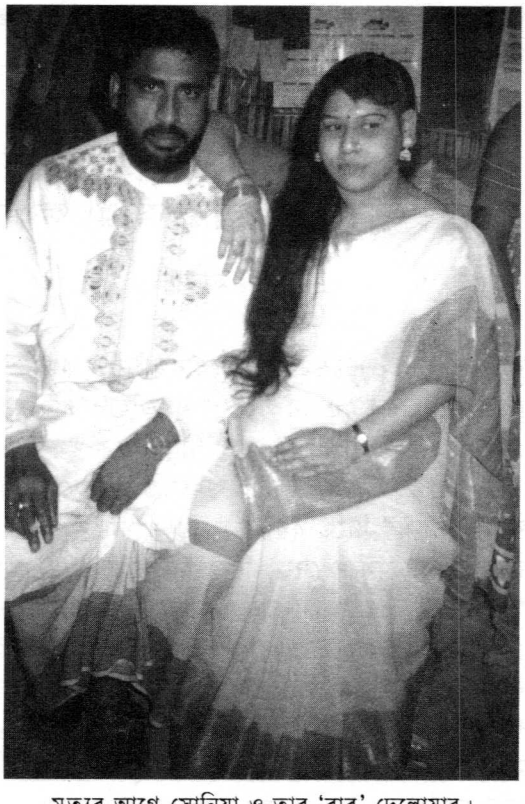

মৃত্যুর আগে সোনিয়া ও তার 'বাবু' দেলোয়ার।

পায়নি। যে দেলোয়ারের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করেছে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি। মৃত্যুর দুইদিন পর ডাক্তার মৃতের পোস্টমর্টেম করেছে এবং এখনো সেই রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

সকল ধর্মেই মৃতের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের এবং মৃতের যথাযথ সৎকারের কথা বলা হলেও সোনিয়ার মৃতদেহের কোনো ধরনের ধর্মীয় সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়নি। স্থানীয় ডোমরা প্রথমে লাশটি আগুনে পোড়ানোর চেষ্টা করে এবং পরে এলাকাবাসীর চাপের মুখে লাশটি মাটিচাপা দিয়ে দেয়।

ফরিদপুর যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের পক্ষে 'জয় নারী কল্যান সমিতি' তাদের সকল প্রকার অধিকার আদায়ের কথা বলে। সমাজে আর দশজনের মত তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে। আমরা আশা করব আর কোনো সোনিয়া যেন এভাবে মারা না যায়, আর কোনো সোনিয়ার মৃতদেহ যেন এভাবে মাটিচাপা দেয়া না হয়।

যৌনকর্মীদের নিয়ে প্রকাশনা

বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি: জীবনের দামে কেনা জীবিকা

লেখক: কুররাতুল-আইন-তাহমিনা ও শিশির মোড়ল

প্রকাশক: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)

মূল্য: বাংলা ২১৩ পৃষ্ঠা, মূল্য: ২০০ টাকা; ইংরেজি ২৭৬ পৃষ্ঠা, ৩০০ টাকা, ১৫ ডলার (ইউএস)

পেশাদার যৌনকর্ম আমাদের সমাজের চোখে একটি অসম্মানজনক কাজ। আর যারা এ পেশায় নিয়োজিত তাদেরকে নানা অশালীন শব্দে আখ্যায়িত করা হয় যার অর্থ যৌনকর্মী নারী হলেন 'পতিতা'। বিভিন্ন সূত্রমতে বাংলাদেশে যৌনকর্মীর সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০ (২০০৪)। এসব যৌনকর্মী [১২টি] যৌনপল্লী, হোটেল এবং ভাসমান (রাস্তাঘাটে) অবস্থায় কাজ করেন। তবে এই সংখ্যার মধ্যে তাদের ধরা হয়নি যারা বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় কাজ করেন এবং যাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। যৌনকর্মীদের একটা বড় অংশ শিশু। যৌন ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সংঘবদ্ধ চক্রের হাতে পড়ে, দারিদ্র্যের কারণে, স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হাতে নির্যাতিত হয়ে বা কাজের সন্ধানে এসে যৌনকর্মীদের অধিকাংশ এ পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

যৌনকর্মীদের উপর তথ্য এবং নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ বাংলাদেশে খুব কম। এই তথ্যশূন্যতার মধ্যে "বাংলাদেশে যৌনতা বিক্রি: জীবনের দামে কেনা জীবিকা" বই এবং এর ইংরেজী ও বর্ধিত সংস্করণ "সেক্স ওয়ার্কার্স ইন বাংলাদেশ, লাইভলিহুড: এ্যাট হোয়াট প্রাইস?"-এর উপর নিঃসন্দেহে নির্ভর করা যায়। কুররাতুল আইন তাহমিনা এবং শিশির মোড়লের লেখা এ বই প্রকাশ করেছে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)। বইটি লেখার জন্য অনুসন্ধানের উদ্যোগও সেড-এর। লেখকদ্বয় সাংবাদিকের দৃষ্টিতে যৌনকর্মীদের অবস্থা গভীর সহমর্মিতা এবং পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। কুররাতুল-আইন-তাহমিনা ও শিশির মোড়ল ১৯৯৯ সাল থেকে যৌনকর্মীদের অবস্থা অনুসন্ধান করছেন। বইটির বাংলা সংস্করণ প্রথম সেড প্রকাশ করে ২০০০ সালে। বইটির ইংরেজি সংস্করণটি পুরোপুরি হালনাগাদ তথ্য সমৃদ্ধ। বইটিতে লেখকদ্বয় যৌনকর্মীদের সিংহভাগ যারা দরিদ্র তাদের কথাই তুলে ধরেছেন। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে বইটি বাংলাদেশের যৌনকর্মের বিভিন্ন দিক এবং উদ্বেগ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। বইটি লেখা হয়েছে সংবাদ লেখার আদলে, যা এ বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে নানা তথ্য এবং বিভিন্ন মানুষের কথা অত্যন্ত যত্নের সাথে তুলে ধরেছেন লেখকদ্বয়। বাংলাদেশে যৌনকর্ম এবং যৌনকর্মীদের ব্যাপারে আগ্রহী যে কারো জন্য বইটি একটি দরকারি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎস হতে পারে।

তৃতীয় প্রকৃতি: বাংলাদেশের হিজড়াদের আর্থসামাজিক চিত্র

লেখক এস এ এম হুসাইন, প্রকাশক: ষড়ঋতু বাংলা ৯৮ পৃষ্ঠা মূল্য: ১৫০ টাকা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'হিজড়া' বলে কিছু নেই। হিজড়া আমাদের সমাজেরই তৈরি অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এরা নানাভাবে চরম বৈষম্যের শিকার। বাংলাদেশে হিজড়াদের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি। তাদের জীবন জীবিকা, অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে এই বই। লেখক নিজে দেশের ছয়টি জেলায় গিয়ে ৮২ জন হিজড়ার ওপর সমীক্ষা চালান। এই বইতে

সমীক্ষার ফলাফল, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, মানবাধিকার কর্মী ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার, ভিন্নধরনের ১৪টি কেস স্টাডি ও দেশী বিদেশী জার্নাল পর্যালোচনা করে আমাদের দেশের হিজড়া সমাজের চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, হিজড়া কারা, তাদের সংস্কৃতি, সমস্যা, শিক্ষা স্বাস্থ্য, যৌন ও দাম্পত্য জীবন, মৌলিক অধিকার, পেশা, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার, মৃত্যু ও সৎকার ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। গবেষণালব্ধ 'তৃতীয় প্রকৃতি' বাংলাদেশে হিজড়াদের জীবনযাপন, আর্থসামাজিক অবস্থা বুঝতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা।

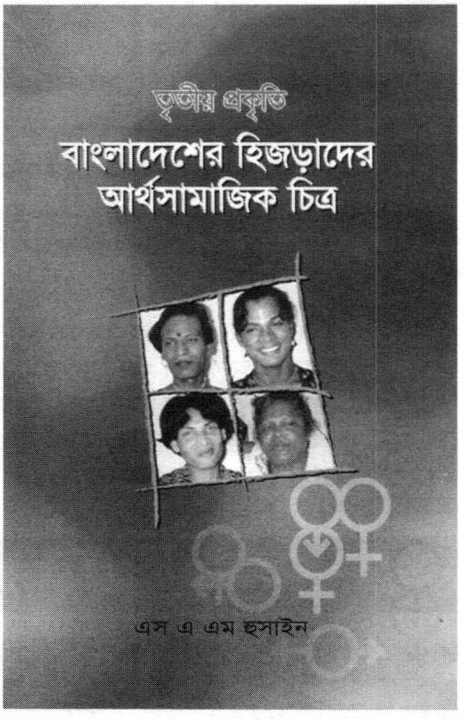

ফিরে দেখা

নারী অধিকার, মানবাধিকার ও যৌনকর্মীদের লড়াই

সম্পাদনা: ফিরদৌস আজীম, মাহবুবা মাহমুদ ও সেলিনা শেলী
প্রকাশক: সংহতি বাংলা ২২৩ পৃষ্ঠা মূল্য: ১০০ টাকা

টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীদের উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে ১৯৯৯ সালে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার বিভিন্ন দিক নিয়ে এই প্রকাশনা। ১৯৯৯ সালের যৌনকর্মীদের আন্দোলনে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল অনেক সংগঠন ও বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ। এভাবেই উন্মোচিত হয় নারী অধিকার ও মানবাধিকার আন্দোলনের একটি নতুন দিক। নারীর মানবাধিকার আন্দোলনে যোগ হয় একটি নতুন মাত্রা। এই আন্দোলনের সময় ৮৬টি সংগঠনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সংহতি নামের একটি মানবাধিকার মোর্চা। সংহতি প্রকাশিত এই বইটির ছয়টি অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে ১৯৯৯ সালের আন্দোলন; নারী ইস্যুকে কীভাবে রাজনৈতিক ও গণমাত্রা দেওয়া যায় তার উদাহরণ; নারীপক্ষ'র উদ্যোগে টানবাজার ও নিমতলীর যৌনকর্মীদের অধিকার রক্ষায় সংহতির জন্ম ও তার বিভিন্ন কর্মসূচি। বইটি সংহতি আয়োজিত সমাবেশ, সাংবাদিক সম্মেলন দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বকে দেয়া চিঠি, ইশতেহার, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি সংকলিত করেছে। বইটির বিশাল অংশ জুড়ে আছে টানবাজার ও নিমতলী যৌনপল্লী উচ্ছেদ ও উচ্ছেদ পরবর্তী অবস্থা নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদন, মতামত ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ। টানবাজার উচ্ছেদের পর সংহতি উচ্ছেদ হওয়া যৌনকর্মীদের ওপর একটি জরিপ চালায়। বইটির শেষ অধ্যায়ে আছে সেই জরিপের সারাংশ। টানবাজার নিমতলী উচ্ছেদের দুই বছর পর প্রকাশিত এই বইটি নারীর মানবাধিকার লড়াইয়ের সেই সময়কে আবার পাঠকের সামনে ফিরিয়ে আনবে।

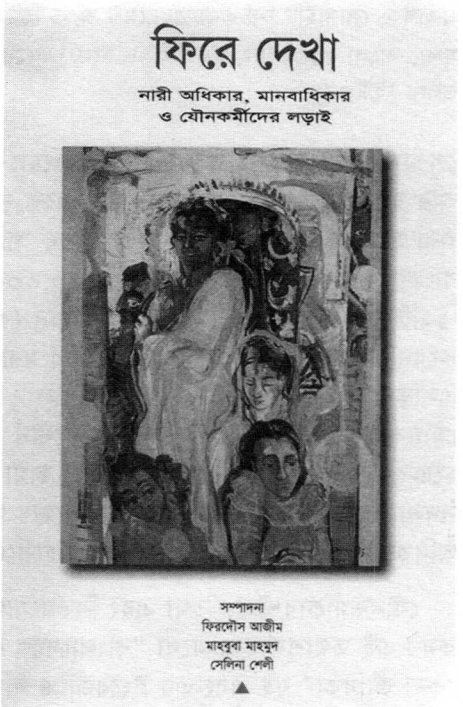

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ও সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ প্রকাশিত। *সম্পাদকীয় উপদেষ্টা:* ফিলিপ গাইন। *সম্পাদনা ও নিউজলেটার কমিটি:* পার্থ শঙ্কর সাহা, আশরাফি ফেরদৌসী বীথি, কাজল, পারুল, রাজিয়া, জয়া সিকদার, সুরাইয়া, ফাতেমা বেগম লাবনী, মুন্নী মৃ ও কথা। *আলোকচিত্রী:* ফিলিপ গাইন। *কম্পোজ ও পৃষ্ঠাসজ্জা:* সুবোধ এম বাস্কে, শামিমুল ইসলাম, ফাতেমা বেগম লাবনী ও লাকী রুগা।

যোগাযোগ

সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ ১২২ পিসি কালচার, ব্লক-ক, রোড নং-১, শ্যামলী, মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ।
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ৪/৪/১ (বি) (তৃতীয় তলা) ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৯১২১৩৮৫, ফ্যাক্স: ৯১২৫৭৬৪, ই-মেইল: sehd@citechco.net